শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(তৃতীয় কিস্তি)

বিকালের দিকে মিল্টন ও বাদল এলো ফাহিমদের বাসায়। ওরা ফাহিমের বন্ধু। একত্রে অনেক দিন পর ওরা বের হলো মহল্লায়। মহল্লার মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা, নাম তার শ্রীনাথ চ্যাটার্জি লেন। এই গলিটা দক্ষিণে বগুড়া রোডের সাথে মিলেছে, উত্তরে মিলেছে কালিবাড়ি রোডের সাথে।

শ্রীনাথ লেনের ঝামেলা হলো, এটা গড়ে উঠেছে মহল্লাবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী। যারা যেখানে জায়গা দিয়েছে, সেদিক দিয়েই গলিটা বয়ে গেছে। নয়তো গলিতে তেরটি বাঁক এবং বারটি পুকুর থাকবে কেন ? তের বাঁকের এ গলিটা নিয়ে অবশ্য মহল্লাবাসীদের কোন অসন্তোষ নেই।

বার পুকুরের শ্রীনাথ লেনের মধ্যে সব ধর্মের মানুষই বাস করে । প্রায় দশ-এগারটি হিন্দু পরিবার থাকে এ মহল্লায়। তিন-চারটি খৃষ্টান পরিবারও আছে। সব ধর্মের মানুষগুলোর মধ্যে চমৎকার সম্প্রীতি। আছে আসা-যাওয়া। ধর্মীয় উৎসবগুলোতে সবধর্মের মানুষেরাই সকলের বাসায় যাওয়া আসা করে। এতে করে সব থেকে লাভবান হয় ছোটরা। তারা তো ধর্ম বুঝে না, বোঝে আনন্দ। যেখানে আনন্দ, সেখানেই ছোটরা।

তিন বন্ধু মিলে গলির দক্ষিণ মাথায় গেল। বগুড়া রোডের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই, দেশ একটা খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সব ধরণের যানবাহনই রাস্তায় দেখা গেল। যদিও সংখ্যায় কম। ওরা গলির ভেতরের দিকে আবার ফিরতে থাকল। ডানে আবু ভাইদের বাসা।

-আবু ভাই, বাসায় আছেন ? বাদল ডাকতে লাগল। কোন উত্তর এল না। মিল্টনও ডাক দিল,বাসায় কেউ আছেন?

-চল বরং সামনে এগোই, ফাহিম বলল ।

পরের বাসাতে তালা ঝুলছে। হলুদ একতলা এ বাসাটি ভাড়া দেয়া। এ বাসায় সুন্দর একটি মেয়ে আছে। ফাহিমদের দুই-চার বছরের বড় হবে। এরপর রানিদি'র বাসা। উনি স্বরস্বতি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। রানিদিকে ফাহিমরা খুব ভয় পায়। ফাহিমের বোন মর্জিনা উনার কাছে এক সময় প্রাইভেট পড়তো। রানিদি'র বাসায় তালা। কেউ নেই সম্ভবত ।

সুধীর চক্রবর্তী এ শহরের একজন বিখ্যাত উকিল। তাঁর বাসাটি রানিদি'র বাসার পরেই। গম্ভির মানুষ। যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। উনার প্রণাম দেয়ার ভঙ্গিটা খুব সুন্দর। ফাহিমের বাবা মজিদ সাহেবকে দেখলে সুধীর কাকা সবসময় প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ভাইজান, ভাল আছেন? সুধীর কাকার বাসায়ও কেউ নেই।

পরের বাসাটি গৌতমদের। মিল্টনদের বন্ধু। মার্চ মাসের শেষের দিকে ওরা গ্রামে চলে যায়। সেখান থেকে ভারতে চলে গেছে বলে শোনা যায়। বাদল ভাবে, গৌতম থাকলে খুব ভাল হতো। ও চমৎকার ক্রিকেট খেলে। লক্ষণ কাকাদের মাঠে এখন খেলা যেত।

নেহালদের বাসা এরপর। বাসার নাম 'সন্তোষ ভবন'। নেহাল ওদের বন্ধু। এই ব্যাটা থাকলেও খুব মজা হতো। মার্চের আগে ঢাকায় ছিল। তারপর মানিকগঞ্জ । এখন কোথায় কে জানে ! বাসাটার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কেউ কি আছে ? ওরা কেউ আর নক করল না। নেহাল থাকলে হাক দেওয়া যেত।

পরের বাসা দুটো খৃষ্টান পরিবারের। একটায় অনু-মনারা থাকে। পরেরটায় থাকে পুনারা। ডাক দিতেই মনা বের হয়ে আসল। যোগ দিল ওদের সাথে। পুনা বাজারে গেছে, পুনার মা বলল। ওদেরকে ডাকল। ফাহিমকে জিজ্ঞেস করল, কখন আসছো? সবাই এসেছে কি না ইত্যাদি।

পুনাদের বাসার পর দুইটা সরকারি বাসা। এর একটিতে মিল্টনের মামা থাকে। মিল্টন মামার বাসায় থেকে পড়াশোনা করছে।

ফাহিমদের বাসা অনু-মনাদের পাশে। রাস্তার ওপারে। বাসার নাম 'নিরালা'। বাদলদের বাসাটা ফাহিমদের বাসার দু'টো বাসা পরে। ওদের বাসার ডান-বামে চারটি হিন্দু পরিবার থাকে চারটি বাসায়। এখানে একটা পুকুর আছে রাস্তার পাশেই। পুকুরটিকে ঘিরে বাসাগুলো। সর্ব ডানে লক্ষন কাকাদের বাসা, বামে মিলু-দুলুদাদের বাসা। সামনেই পানু নাহা-সোনাই নাহা কাকাদের বাসা। নাহাদের পাশ দিয়ে শ্রীনাথ লেনটি আরও আঁকাবাকা হয়ে কালিবাড়ি রোডের দিকে এগিয়ে গেছে ।

পুনাদের বাসা থেকে রাস্তায় ফিরতেই ওরা একটা ঝাঁকি খেল, একজনকে দেখে। 'স্বপনদা না?' কিন্তু এগুলো কি পোশাক পরেছেন উনি ? পাজামা-পাঞ্জাবি ও টুপি মাথায়। স্বপনদা ঠিক তার মতই হেসে হেসে আমাদের দিকে আসতে থাকল।

স্বপনদার বাসা শ্রীণাথ লেনের মাঝামাঝি। ধোপা বাড়ির পেছনে। এবার মেট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। শুনলাম, মার্চ মাসের শেষের দিকে উনারা সবাই চলে যান বাকেরগঞ্জে। উনাদের গ্রামের বাড়িতে । স্বপনদার ঠাকুর মা থাকতেন উনাদের সাথে। উনি জেদ ধরেছেন, কোথাও যাবেন না। ঠাকুর মার ধারণা, কাউকে না কাউকে বাসায় থাকতে হবে। নয়তো বাসা অন্য কেউ নিয়ে যাবে।

স্বপনের ঠাকুর মাকে সত্যিই বাসা থেকে অন্য কোথাও নেয়া গেলনা। বাদল জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, আপনার এই বেশ কেন ?

-অনুমান করতো।

-আপনারা কি মুসলমান হয়ে গেছেন ? মিল্টন বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল।

-আমরা না। আমি হয়ে গেছি।

-কেন?

-সে লম্বা ইতিহাস। সে গল্প আরেক দিন করি ?

-আপনাদের গ্রামের দিকে কি মিলিটারি গেছে ?

-গেছে মানে? বহু বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের দশটি ঘরের মধ্যে একটিও অবশিষ্ট নাই। পুড়ে ছারখার। বাবা, মা, ভাইবোন- ওরা সব ইন্ডিয়া চলে গেছে।

-আপনি যাননি ?

-না, আমি দিদিদের বাড়ি চলে গেছি। আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দশেক হবে উনাদের বাড়ি।

-শুনলাম, আপনার ঠাকুর মা এখানে। উনি কেমন আছেন ?

-ভাল আছেন। উনাকে দেখতেই তো এলাম।

-উনাকে কি নিয়ে যাবেন ?

-আরে বলো না, বুড়ি যেতে চায় না। ফাহিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ফিরোজ ভাই কি এসেছে ?

-জ্বী । আচ্ছা স্বপনদা, যুদ্ধ কি শুরু হয়ে গেছে ?

-কোথায় শুনেছিস?

-স্বাধীন বাংলা বেতারে। সত্যি ?

-স্বপন মিটিমিটি হেসে চলে যাচ্ছে ফাহিমদের বাসার দিকে। কিছু বলছে না। স্বপন ফিরোজ ভাইকে খুব মানে। কারণে-অকারণে আসে। বুদ্ধি-পরামর্শ নেয়। ফিরোজ ভাইও ওকে স্নেহ করে।

ফাহিমদের ছোট দলটি এবার এগুলো ‘বাগান’ এর দিকে। মহল্লায় ওই বাগানটি হলো মিল্টনদের বাসার পেছনে। লক্ষণ কাকাদের বাসার ঠিক পশ্চিম পাশে। যে সরকারি কোয়ার্টারে মিল্টনের মামারা থাকে, সেই কোয়ার্টারের অংশ মনে হয় এই বাগানটি । বেশ বড়, পরিত্যক্ত । সন্ধ্যার পর এখানে শিয়াল ডাকে। দশটিরও বেশি পরিবারের ঘর বাড়ি এখানে তৈরী হতে পারে। বর্ষা চলে এসেছে। জঙ্গল এজন্য আরো বেশি। ভেতরে ঢুকলে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। মিল্টন-ফাহিমরা এখানে ছোটবেলা থেকে ‘পলাপলি’ খেলে। মানে হাইড এ্যান্ড সিক খেলা।

ফাহিমের বন্ধু বাদল একবার চমৎকার একটি জায়গায় লুকাল। এবং সেখানে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, ওর বাসার সবাই খুঁজছে বাদলকে। এক পর্যায়ে বড়রাও খুঁজতে নেমে গেল

হারিকেন নিয়ে। মশার কামড়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল বাদলের। শুনলো, তার নাম ধরে ডাকছে অনেকে। জঙ্গল থেকে বেরুতেই বাদলের বড় ভাই বড় করে একটা চড় বসালো বাদলের গালে।

বাগানটির ঠিক মাঝখানে একটি বড় রেইনট্রি গাছ। শুধু বড় বললে কম বলা হয়, অনেক অনেক বড় এ গাছটি। এর শিকড়গুলোর অংশ বিশেষ মাটির উপরে। ওরা বসল শিকড়ের উপর। ওখান থেকে চতুর্দিক কিছুই দেখা যায় না। শুধু আকাশের কিছু অংশ দেখা যায়।

বাগানের তিন দিকেই খাল। একদিকে মিল্টনদের বাসার পেছনের উচু বেড়া। পুর্ব ও পশ্চিমে খালের উপর একটা করে সরু গাছ ফেলা। খালগুলো অবশ্য গরম ও শীতে প্রায় শুকিয়ে যায়। পানি থাকে অল্প। পেছনের বেড়ার পশ্চিম পাশের একটি অংশ ভেঙে বড় একটি গর্তের মতো হয়েছে। একজন অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারে। ওরা ওই পথেই ভেতরে ঢুকেছে।

বাদল বলল, আচ্ছা, এই জায়গাটা তো আমরা আমাদের মত করে ব্যবহার করতে পারি না, তাই না ?

-কী ভাবে ? জানতে চাইলো মনা।

-ধর, আমরা যদি পূর্ব-পশ্চিমের খাল পারাপারের গাছ দুটোকে ফেলে দেই ?

-মিল্টন বলল, হ্যাঁ। তাহলে এটা শুধু আমাদের খেলার জায়গা হবে। অন্য কেউ সহজে আসতে পারবে না। মানে কষ্টকর হবে।

-ঠিক। সেক্ষেত্রে বেড়ার এ জায়গাটায় কিছু ডাল পালা দিয়ে এমন অবস্থা করতে হবে, যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে।

-তা সম্ভব। মিল্টন বলল। এমনিতে আমারা এখন বেড়ার ভেতরের জায়গাটা ব্যবহার করি না। কোণার ওই অংশে তো যাওয়াই হয় না, জঙ্গলের কারণে। কয়েকটা কলা গাছও রয়েছে ওখানে। সহজে চোখেও পড়ে না ভাঙ্গাটা।

যেই বলা সেই কাজ । মাগরিবের আযানের পর চতুর্দিকে যখন অন্ধকার নেমে আসল, ওরা খালের উপরের গাছ দুটো টেনে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল।

রাতের খাবার খাচ্ছিল ফিরোজ । মজিদ সাহেব একটু আগে খেয়েছেন অফিস থেকে ফিরে। তিনি দূরে একটা চেয়ারে বসে পেপারে চোখ বুলাচ্ছিলেন।

-বাবা, তোমার অফিস কেমন চলছে, জানতে চাইলো ফিরোজ ।

-চলছে আর কি। কাজ-কর্ম খুব কম। মানুষের ধান্ধা এখন অন্য কিছু। খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা মাত্র।

-রাস্তা-ঘাটে মানুষজন কেমন দেখছো ?

-মানুষজন কম। তবে আছে। ভীত ভীত ভাব। মোড়ে মোড়ে মিলিটারি । এর মধ্যে নির্ভয় হওয়া কি সম্ভব ? তোর খবর বল এখন। ঢাকা ভার্সিটিতে নাকি ক্লাস শুরুর চেষ্টা চলছে। যাবি নাকি ঢাকা ?

-না বাবা, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব গ্রামে কিংবা ইন্ডিয়া চলে গেছে। ওদেরকে ফেলে দেশের এ অবস্থায় আমার কলেজে যেতে ইচ্ছে করছে না।

-আচ্ছা, এ অবস্থা তো দুই-তিন বছর কিংবা আরো বেশি চলতে পারে।

-আমার তা মনে হয় না বাবা। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ ইন্ডিয়া যাচ্ছে। হাজার হাজার ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে আবার ফিরে আসছে। যুদ্ধ করছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ বছরের পর বছর চলতে

থাকবে, তা মনে হয় না। এছাড়া বিশ্বজনমত আস্তে আস্তে আমাদের পক্ষে জোরদার হচ্ছে। ফিরোজ বলল।

-সব ঠিক আছে। কিন্তু ঘরে বসে সময় কি কাটবে তোর ?

-কি আর করবো বাবা। তোমরা তো আমাকে আটকে দিলে। যুদ্ধে যেতে দিলে না। তবে বাবা, আমি বসে নেই। পাঠ্য কিছু বই জোগাড় করে ফেলেছি। দেখছি মাঝে মাঝে ওগুলো। পাশাপাশি ডাইরি লিখছি। যা রেডিওতে শুনছি, চোখে দেখছি, সব ডায়রিতে লিখে রাখছি। এর উপর ভিত্তি করে একটি বই লিখব পরে।

ফাতেমা বেগম ছেলের পাশে এসে বসলেন। তার শরীরটা একটু ভাল। মেডিকেলের একজন বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। অনেক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরে ওষুধ দিয়েছেন। রক্তচাপ এখন কন্ট্রোলে। এক মাস পর আবার যেতে বলেছেন।

দুই মাস পর ফাহিম স্কুলে গেল। বরিশাল জিলা স্কুল। বেশ বড় ক্যাম্পাস। মাঝখানে মূল বিল্ডিং। উপরের ক্লাসগুলো এই বিল্ডিং এ। উত্তরপাশের নতুন দোতলা বিল্ডিংয়ে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলো।

মিলিটারিরা পুরো দোতলা বিল্ডিংটা দখল করে নিয়েছে। তাদের থাকা-খাওয়া-পিটি এখন এই বিল্ডিং এবং সংলগ্ন মাঠে। ফাহিমদের ক্লাস চলে গেল মূল বিল্ডিংয়ের হল রুমের এক কোণায়। অন্য তিন কোণায় আরো তিনটি ক্লাস। সুতরাং মনোযোগ দেয়া কঠিন।

গমগমে একটি আওয়াজ সবসময় চতুর্দিকে। যে কারণে শিক্ষকদের জোরে চিৎকার করে পড়াতে হচ্ছে। যা সত্যিই ক্লান্তিকর। কী আর করা।

টিফিনের সময় সবাই ভীড় করে দুই বিল্ডিং এর মাঝে। তাকিয়ে দেখে মিলিটারিরা কী করছে। কেউ তো আসলে মিলিটারি আগে দেখেনি। ফাহিমের হাতে একটি রাবারের বল। বলটি হঠাৎ গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। কেউ একজন পাশ থেকে কিক দিল। বলটি গড়িয়ে উত্তরের বিল্ডিংয়ের দিকে চলে গেল। ও পা বাড়াল আনতে। হঠাৎ দূরে গার্ড দিচ্ছে, ইউনিফর্ম পড়া এক মিলিটারি চিৎকার করে উঠলো, 'স্টপ স্টপ, ডোন্ট গো দেয়ার।'

ফাহিম আঁতকে উঠল। কারণ হতে পারে, বলটার রঙটা অন্য রকম। তাছাড়া সবচেয়ে ভীতিকর হল, লোকটা রাইফেলটা তাক করে ধরেছে ওর দিকে। ফাহিম পিছিয়ে গেলো দু'পা। এবং ভয়ে কাঁপতে লাগলো। অন্য আর একজন মিলিটারি এগিয়ে গেল এবং বলটি ফেরত দিল। বল না নিয়েই ফাহিম মূল ভবনে ঢুঁকে পড়লো। পাকিস্তানি সৈন্যরা যে এত খারাপ, এই প্রথম বুঝতে পারলো ও।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক